18 Ibid, P-467.
১৯ প্রাণগোবিন্দ দাশ, *রাষ্ট্রচিন্ড়ার ইতিবৃত্ত*, কলিকাতা: নিউ সেন্টাল বুক এজেন্সি (প্রা:) লিমিটেড, ২০০১, পৃ. ৩৯৮।

ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 04. No. 01. August 2010

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ড. মো. ফিরদাউস হোসাইন*

Abstract : Islam as the way of life fully dispersed all over the world with the vigor initiative triggered by Prophet Muhammad (sm.) with the grace of Almighty Allah, the most gracious, most merciful. No region of the planet which kept in touch of the enlightened and welfare values of Islam, thereby being acquainted with Islam as the religion of peace. Bangladesh as the part of Indian Sub-continent took the flavor of Islamic principles and values that assist us (people of Bangladesh,) till now, keeping continue the entity of Muslim or practicing Muslim. The advent of Islam in Bangladesh has it long historical past where some devotees did their best to preach the true path of Islam. In this point, the study is an attempt to identify the various ways through which advent of Islam in Bangladesh became possible and what is the chronological background and who are the devotees in spreading Islam in Bangladesh. In fact, to enlighten the historical background of the advent of Islam in Bangladesh and its methods of preaching by enthusiastic disciples to the people is the substantial objective of the study.

ভূমিকা: ইসলামের জ্ঞান ও পথ নির্দেশনার শ্রেষ্ঠ উৎস দুইটি: আলণ্ডাহর কিতাব ও সর্বশেষ নবী (স.) এর আদর্শ জীবন ও তাঁর সুন্নাহ। আলণ্ডাহর পথে মানুষকে আহ্বান করতে কতই না অনুপম ভঙ্গিতে মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে আল কিতাব। এ মর্মে আলণ্ডাহ বলেন,তার কথার চেয়ে কার উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আলণ্ডার দিকে আহ্বান করে ও সৎকার্য সম্পাদন করে এবং বলে আমি একজন মুসলিম।[১]

অতপর মহানবী (সা.) এর নির্দেশ 'উপস্থিত সকলের দায়িত্ব হচ্ছে অনুপস্থিতদের নিকট বানী পৌছিয়ে দেয়া'[২] শ্রবণের পর তাঁর সাহাবীগণ ইসলামের মহান *দাওয়াত* নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা এবং তাঁদের শিক্ষায় উদ্দীপ্ত তাবি'ঈ ও তাবি-তাবি'ঈন এবং পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে বণিক ও সূফীগণ ইসলামের মহান বাণী নিয়ে এ উপমহাদেশে আগমন করেন।[৩] আরব মুসলমানদের মাধ্যমে সর্বপ্রথম এদেশে ইসলামের

* সিনিয়র লেকচারার, ডিপার্টমেন্ট অফ ইসলামিক স্টাডিজ, বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি ঢাকা।

আগমন ঘটে এবং পরবর্তীকালে সূফী, দরবেশ ও 'উলামায়ে কিরামের মাধ্যমে এদেশে ইসলাম প্রসার লাভ করে।[৪] তবে এটা পরিষ্কার নয় যে, কখন এদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশাতে নাকি তাঁর ইন্তিকালের পর, এ প্রশ্নের সঠিক সমাধান এখনও দুরূহ ব্যাপার হয়ে আছে। কারণ এসব অঞ্চলে ইসলামের আগমন ও প্রসার সম্পর্কিত সঠিক ইতিহাস, প্রমাণ্য দলিল ও ঐতিহাসিক বিবরণের অভাবে অন্ধকারেই রয়ে গেছে। তাই কিছু ইঙ্গিত, অনুমান, বিক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং সর্বোপরি যুক্তিকে সম্বল করে বলা যায় যে, মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশাতেই সাহাবীদের মাধ্যমে এ দেশে ইসলামের আগমন ঘটে।[৫] রাসূল (সা.) এর মামা সম্পর্কীয় সাহাবী আবূ ওয়াক্কাস মালিক ইবন উহায়ব ইবন 'আবদি মানাফ সমুদ্র পথে চীন যাওয়ার প্রাক্কালে বাংলাদেশে আগমন করেন।[৬] এছাড়াও মহানবীর (সা.) জীবদ্দশায় ভারতীয়দের পক্ষ থেকে তিনি সুগন্ধী জাতীয় দ্রব্য সামগ্রী এবং আচার উপহার পেয়েছিলেন এবং আয়িশা (রা.) অসুস্থতার সময় আরবে অবস্থানরত একজন ভারতীয় চিকিৎসককে রোগ সম্পর্কে অবহিত করেন। এসব বিবরণ দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় যে, মহানবীর (সা.) সময়কালে আরবের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের যোগাযোগ ছিল এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই এ উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে।[৭]

বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের ধারা

এ উপমহাদেশে ইসলাম আগমনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিম দা'য়ীদের এ দেশে আগমনের দুটি পন্থা রয়েছে। এক. নৌপথে মুসলমানদের আগমন, দুই. স্থল পথে মুসলমানদের আগমন।

নৌপথে মুসলমানদের আগমন

মহানবীর (সা.) আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই উপমহাদেশের সাথে আরবদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল।[৮] 'ঈসা (আ.) এর জন্মের কয়েক হাজার বছর পূর্বে দক্ষিণ আরবের সাবা সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা পাল তোলা জাহাজে করে এদেশে আসতো। উক্ত সাবা সম্প্রদায়ের নামানুসারে নামকরণকৃত শহর "সাবাউর" যা ঢাকার অদূরে সাভার নামে পরিচিত।[৯] ইউসুফের (আ.) আমল থেকেই এ উপমহাদেশের সাথে আরবদের চমৎকার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।[১০] মিশর থেকে সুদূর চীন পর্যন্ড় দীর্ঘ নৌপথে আরবগণ যাতায়াত করত। আরব বণিকদের জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূল পার হয়ে চীন দেশে যাবার পথে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করত। কাজেই বাংলার উপকূলে তাদের আনাগোনা হতো।[১১] খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকে বঙ্গোপসাগর জাহাজ চলাচল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বাংলার উপকূলে তাম্রলিপি (তমলুক) ও শৎগঙ্গ (চট্টগ্রাম) ছিল প্রধান বন্দর।[১২] এছাড়া ব্যবসায়ীরা কালিকট ও মাদ্রাজ হয়ে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতো। এখানে তারা প্রথমে সিলেট যেত, সিলেটকে আরবরা "*সালাহাত*" বলতো। তারপর তারা ভারত ও চীনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী বন্দর সিয়াম হয়ে চীন সাগরে পাড়ি জমাতো।[১৩] আরব দেশ এশিয়া ও ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এ অঞ্চলের বাণিজ্যের চাবিকাঠি ছিল আরবদের হাতে। ভারতের উপকূলীয় বাণিজ্যে তাদের ছিল একচেটিয়া আধিপত্য। তারা

ভারত থেকে গরম মশলা, গজদন্ড়, নানাবিধ রত্ন মিহি সূতি ও রেশমী বস্ত্র মধ্য এশিয়ায় ও ইউরোপের বাজারে রপ্তানী করতো।[১৪] আরব বণিকগণ এই পথ ধরেই বাংলাদেশ ও কামরূপ (বর্তমান আসাম) হয়ে চীনে যাতায়াত করত। মালাবার ছিল মধ্য পথের প্রধান বন্দর। মুসলিম বণিকদের সাহায্যে সপ্তম শতকের প্রথম দিকেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার রাজ্যে ইসলাম প্রচার শুর হয়। সেখানকার হিন্দু রাজা চের মল পের মল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার অভিলাষে মক্কা গমন করেন। শায়খ জয়নুদ্দীন তার *তুহফাতুল মুজাহিদীন ফী বা'যে আওয়ালিল বুরতুকালীন* গ্রন্থে লিখেছেন যে, আরব দেশের একদল লোক জাহাজযোগে মালাবারে আগমন করেছিলেন। তাদের দা'ওয়াতে রাজা চের মল পের মল ইসলামে দিক্ষীত হন। এরপর মহানবীর (সা.) সাথে সাক্ষাত লাভের বাসনায় রাজা একদল লোক নিয়ে মক্কায় পৌঁছান। তিনি মহানবীর (সা.) জন্য কিছু মূল্যবান উপঢৌকনও সঙ্গে নেন।[১৫] মহানবীর (সা.) সাহাবী ও মামা আবূ ওয়াক্কাস মালিক ইবন উহায়ব নবুয়তের পঞ্চম সালে ৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে হাবশায় হিযরত করেন। তিনি কায়স ইবন হুযাইফাহ (রা.), 'উরওয়াহ ইবন আছাছা (রা.), আবূ কায়স ইবন হারিছ (রা.) এবং কিছু সংখ্যক হাবশী মুসলিমসহ দু'টি জাহাজে চীনের পথে সমুদ্র পাড়ি দেন। আবূ ওয়াক্কাস (রা.) দীর্ঘ নয় বছর সফরে ছিলেন। মালাবারের রাজা চের মল পের মল তার কাছে ইসলামের *দা'ওয়াত* পেয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়।[১৬]

খ্রিষ্টীয় ৬২৬ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ে আবূ ওয়াক্কাসের কাফেলা চীনে অবতরণ করে। দলনেতা আবূ ওয়াক্কাস (রা.) ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। তার প্রতিষ্ঠিত *কোয়াংটাং* মসজিদটি এখনও সমূদ্র তীরে সুউচ্চ মিনার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদের অদূরেই তার কবর রয়েছে। দু'জন সাহাবীর কবর রয়েছে চুয়ান-চু বন্দরের নিকটবর্তী লিং পাহাড়ের ওপর। চতুর্থজন দেশের অভ্যন্ড়রে চলে যান।[১৭] চীন যাবার পথে দীর্ঘ নয় বছরের সফরে তার মাধ্যমে ইসলামী *দা'ওয়াত* ভারতে এবং বাংলাদেশসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে পৌঁছে। কেননা চীন যাবার পথে তাকে বিভিন্ন বন্দরে নোঙর করতে হয়েছে। যার কারণে তিনি বাংলাদেশের বন্দরগুলোতেও নোঙর করেছেন বলে ধারণা করা হয়। আর তার পবিত্র সাহচর্যে এসে বাংলাদেশে কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৮]

এসব তথ্য প্রমাণ করে যে, রাসূলের (সা.) যুগেই চীনে সর্বপ্রথম ইসলাম পৌঁছে এবং তা পৌছে একদল খাঁটি আরব মুসলিমের নেতৃত্বে। যাঁরা বাংলাদেশের বন্দরগুলোতে নোঙর করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে চীন অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন তাঁরা বাংলাদেশেও ইসলাম প্রচার করেছেন। সুতরাং খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকেই বাংলাদেশে প্রথম ইসলামের আগমন ঘটে। আরবদের বাণিজ্যিক বহর আরব সাগর হয়ে ভারত মহাসাগর দিয়ে জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও ও মালয়েশীয়ার উপকূলে পাড়ি জমাতো এবং আরো উত্তরে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরের তীরে গাঙ্গেয় মোহনায় নোঙর করত। অষ্টম ও নবম শতকের চট্টগ্রাম ও আরাকানের ঘটনাবলীতে এসবের প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে এ পথেই অষ্টম শতকে ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের আলো অনুপ্রবেশ করে।[১৯]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন খুরদাযবিহ (মৃত্যু ৩০০ হিজরী) তার *'আল মাসালিক ওয়াল মামালিক'* গ্রন্থে বলেন, "কামর"ন (কামরূপ) থেকে সমন্দরে চন্দন কাঠ মিষ্ট পানির মাধ্যমে (নদীপথে) পনের-বিশ দিনের মধ্যে আনীত হয়।[২০] আর ইদ্রিসী (মৃত: ৫৪৯ হিজরী) তার *'নুযহাতুল মুশতাক'* গ্রন্থে বলেন, সমন্দর একটি বড় শহর, বাণিজ্যকেন্দ্র ও সমৃদ্ধশালী স্থান। এখানে (ব্যবসা-বাণিজ্যে) অনেক লাভবান হওয়া যায়। ড. আব্দুল করীম তাঁর চট্টগ্রামে ইসলাম গ্রন্থে এ সমন্দরকে চট্টগ্রাম হিসেবে প্রমাণ করেছেন।[২১] আল ইদরিসী সমুদ্র বন্দরের কথা উলেণ্টখ করে আরও বলেন যে, এটি একটি বড় বন্দর এবং কামর"প থেকে নদীপথে কাঠ এনে এখানে বিক্রয় করা হয়। তিনি আরো জানান এই বন্দরটি একটি বড়ো নদীর মোহনায় অবস্থিত।[২২] বিশেষজ্ঞরা এ বড় নদীকে মেঘনা নদী বলে চিহ্নিত করেছেন। আর এইসব বর্ণনা ইঙ্গিত বহন করে যে, মেঘনা তীরের চাঁদপুরই ছিল সেই নদীবন্দর, যেখানে আরব বণিকগণ প্রধানত চন্দন কাঠের জন্য আসতেন।[২৩]

ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনীতে বিভিন্ন স্থানে তিনি বাঙ্গালার সূক্ষ্ম সূতিবস্ত্রের (মসলিন) উলেণ্টখ করেছেন। বাংলার এ সূক্ষ্মবস্ত্র (মসলিন) ও চন্দন কাঠ আরব বণিকদের কাছে সুপরিচিতি ছিল। এ মসলিন ঢাকায় তৈরী হতো এবং চট্রগ্রাম বন্দর দিয়েই বিদেশে রপ্তানি হতো। ড. এ রহিমের মতে, চাটগাঁ নামটাও আসলে আরবদের দেয়া। গঙ্গার ব-দ্বীপ (বা শেষ প্রান্ড়ে এ স্থানটির অবস্থিতি বলে আরব বণিকরা এর নাম দেয় শাতি-উল-গঙ্গা (গঙ্গার শেষ প্রান্ড় বা উপদ্বীপ)। তা থেকে কালক্রমে চাটগাঁও ও চিটাগং বা চট্টগ্রাম এ রূপান্ড়র ঘটেছে।[২৪]

চীনা পরিব্রাজক ফা হুয়ানের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মাঝামাঝি কোন এক জায়গায় জাহাজ নির্মাণ কারখানা ছিল। এখানে সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরি ও মেরামত করা হত। এখানকার তৈরী জাহাজ সমগ্র প্রাচ্যে ব্যবহার হত। এ পথে যাতায়াতকারী জাহাজগুলো এ বন্দরে স্বাভাবিকভাবেই যাত্রাবিরতি করতো। এজন্য ইতিহাস গবেষকগণ মনে করেন, রাসূলের (সা.) মামা হযরত আবূ ওয়াক্কাস (রা.) চীন যাবার পথে এখানে যাত্রাবিরতি করেন।[২৫] এখান থেকে তিনি প্রয়োজনীয় লোক লস্কর ও রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তীতে আরও অনেক আরব বণিক এ পথে যাতায়াতের সময় চট্টগ্রামে যাত্রাবিরতি করে এবং লোক লস্কর ও রসদাদি সংগ্রহের পাশাপাশি তারা উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।[২৬]

চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাথে যে অতি প্রাচীন কাল থেকে আরব বণিকদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তার স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ, আরাকান রাজবংশীয় উপখ্যান 'রাদজা তুয়ে' বর্ণিত একটি উপাখ্যান বর্ণনা করা যেতে পারে। এতে বলা হয়েছে "এই সময়ের শেষ ভাগে কান-রাদজাগীর বংশধর মহত ইঙ্গত চন্দয়ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজা ২২ বছর রাজত্ব করার পর মারা যান। কথিত আছে যে, তার সময়ে (৭৮৮-৮১০) কয়েকটি কু-ল অর্থাৎ বিদেশী জাহাজ রণবী (বর্তমানে রামরী) দ্বীপের সাথে সংঘর্ষে ভেঙে পড়ে এবং মুসলমান আরোহীদের আরাকান পাঠানো হয়। সেখানে তারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস শুর" করেন।[২৭]

আরব ভূগোলবিদ আবুল কাসিম 'উবাইদুলণ্ঢাহ ইবন খুরদাযবিহ লিখেন যে, সরন্দ্বীপের পর *জাযীরাতুর* রামি নামক একটি ভূখ" আছে। আল মাস'উদী উলেণ্টখ করেন যে, ভারত সাগরের তীরে নদী বিধৌত একটি দেশ রয়েছে। ইয়াকুত ইবন 'আব্দুলণ্ঢাহ এ ভূ-খ"টিকে মালাক্কার দিকে ভারতের দূর"ম অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এক সময় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি বিস্ড়ৃত অঞ্চল জুড়ে রামি বা রামু নামে একটি রাজ্য ছিলো। সুলাইমান নামক একজন আরব বণিক বলেন যে, রামির রাজার পঞ্চাশ হাজার হাতি এবং পনের হাজার সৈন্য ছিল।[২৮] এ সব তথ্য এ ইঙ্গিত বহন করে যে, আরব ভূগোলবিদগণ *জাযীরাতুর রামি* নামে যে ভূ-খন্ডের উলেণ্টখ করেছেন, তা চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ছিল। কক্সবাজারের সমুদ্র সন্নিকটবর্তী আজকের রামু সেই রাজ্যেরই একটি ক্ষুদ্রাংশ।[২৯] এ সব আলোচনা দ্বারা আরব বণিকদের সাথে চট্টগ্রামের যোগাযোগের বিষয়টি প্রমাণ করে।

রাজশাহী জেলার অন্ড়র্গত পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের সময় বৌদ্ধ রাজা ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত সোমপুর বিহারে বাগদাদের আব্বাসীয় বাদশাহ হার"নুর রশীদের আমলের একটি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায়। মুদ্রাটিতে ১৭২ হিজরী সনের (৭৮৮ খৃষ্টাব্দ) তারিখ খোদিত রয়েছে।[৩০] অন্যদিকে কুমিলণ্ঢা জেলার ময়নামতিতে অনুরূপ খনন কার্যের কালে আব্বাসীয় যুগের কতিপয় আরবীয় মুদ্রা পাওয়া যায়। আরাকানের রামরা দ্বীপের আরবীয় মুসলিম বণিকদের জাহাজ ভাঙার ঘটনার সাথে এ মুদ্রাগুলোর সম্পর্ক থাকা বিচিত্র কিছু নয়। কারণ স্বাভাবিক ভাবেই ধারণা করা যেতে পারে যে, মুদ্রাগুলোতে উলিণ্টখিত সময়েই (৭৮৮ খ্রী.) বাংলায় নীত হয়েছিল। রামরী দ্বীপে জাহাজ ভাঙার ঘটনাটিও ঘটে ৭৮৮ থেকে ৮১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে।[৩১] সম্ভবত আরব বণিকদের দল বাংলার বৃহত্তম নদী গঙ্গার উপকূল বেয়ে দেশের অভ্যন্ড়রে প্রবেশ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি ধর্মালোচনা ও ধর্ম প্রচারার্থে তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় কেন্দ্র পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার ও ময়নামতির শালবন বিহারে গিয়ে থাকতেন এবং তাদের কাছ থেকেই এ মুদ্রাগুলো সংশিণ্টষ্ট বৌদ্ধ বিহারসমূহে আমদানি করা হয়।[৩২]

বাংলার উপকূল থেকে নিয়ে অভ্যন্ড়রভাগ পর্যন্ড় আরব বণিকদের যাতায়াত সম্পর্কে ড. এ রহীম তাঁর গ্রন্থে ইবন খুরদাযবীহ, মাস'উদী, আল-ইদ্রিসী প্রমুখ আরব ভূগোলবিদ ও পর্যটকদের মতামত উদ্ধৃত করে গঙ্গার এ ব-দ্বীপ অঞ্চলের সাথে আরব বণিকদের প্রাচীনতম সম্পর্কের কথা প্রমাণ করেছেন।[৩৩]

রংপুর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে লালমনিরহাটের সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার মজদের আড়া গ্রামে ৬৯ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত একখানা মসজিদের ধ্বংসস্তুপ পাওয়া গেছে। কারবালায় নবী দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা.) এর শাহাদতের মাত্র আট বছরের ব্যবধানে এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের চব্বিশ বছর আগে উমাইয়া শাসনকর্তা প্রথম মারওয়ানের পুত্র আব্দুল মালিকের শাসনামলের এই মসজিদ বাংলাদেশে এ যাবৎ প্রাপ্ত ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন।[৩৪]

মাওলানা আব্দুর রহীম বাংলাদেশে ইসলামের আগমন প্রসঙ্গে বলেন, পাকভারত উপমহাদেশের সাথে আরব দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক অতিশয় প্রাচীন। কাজেই ষষ্ঠ 'ঈসায়ী শতকে আরব সাগরের পশ্চিম উপকূলে আরব দেশে যে বিপণ্ঢব সাধিত হয়েছিল, পূর্ব উপকূলে অবস্থিত পাক ভারত উপমহাদেশে তার প্রথম তরঙ্গাভিঘাত এসে পৌছা অত্যন্ড় স্বাভাবিক ছিল। নির্ভরযোগ্য ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী বিপণ্ঢবের প্রথম কয়েক বৎসর ও প্রথম খলীফার আমলে না হলেও দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের (রা.) খিলাফত কালে বিশ্বনবীর সাহাবীদের কেউ কেউ উপমহাদেশে আগমন করেছিলেন।[৩৫] এ সময় কয়েকজন সাহাবীর ভারত আগমনের খবর পাওয়া যায়। সে সমস্ড় সম্মানিত সাহাবীরা হলেন- ১. হযরত ইবন 'আব্দুলণ্ঢাহ ইবন 'আব্দুলণ্ঢাহ ইবন 'উতবান (রা.) ২. হযরত 'আসিম ইবন 'আমর আত-তামীমী (রা.) ৩. দুহার ইবন আল-'আবদী (রা.) ৪. সুহায়ব ইবন 'আদী (রা.) ও ৫. আল হাকাম ইবন আবিল 'আস আছ-ছাকাফী (রা.)।[৩৬]

'উছমান (রা.) এর আমলে দু'জন সাহাবীর নাম পাওয়া যায়, যারা ইসলাম প্রচারের জন্য ভারতে এসেছিলেন। তারা হলেন 'উবাইদুলণ্ঢাহ ইবন মা'মার আত-তামীমী (রা.) ও 'আব্দুর রহমান ইবন সামুরা ইবন হাবীব ইবন 'আবদ শামস (রা.)। 'আলী (রা.) এর আমলে এ অঞ্চলে সাহাবীরা এসেছিলেন বলে জানা যায়; কিন্তু কোন নাম পাওয়া যায়নি। তবে আমীর মু'আবিয়া (রা.) এর শাসনামলে একজন সাহাবীর নাম পাওয়া যায়, তিনি হলেন সিনান ইবন সালামাহ ইবন আল-মুহাব্বিক আল-হুযালী (রা.)।[৩৭] উলিণ্ঢখিত সাহাবী বাদেও অনেকে ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারার্থে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশে এসে থাকতে পারেন। যার প্রমাণ ৬৯ হিজরী সনে নির্মিত মসজিদের আবিষ্কার। বস্তুত বাংলার উপকূল অঞ্চলে আরব বণিকদের আগমনের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচার হয়।[৩৮] ইসলামের সোনালী যুগের এবং তার নিকটবর্তী যুগের মুসলমানগণ যে উদ্দেশ্যে যেখানেই যেতেন না কেন, তাঁরা ইসলামী জীবন দর্শনের মর্মকথা মানুষের সামনে উপস্থাপন করার কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যে সকল মুসলিম বণিক বাংলাদেশে এসেছিলেন তাঁরাও মুবালিণ্ঢগ হিসাবে তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন। তবে তাদের তৎপরতা ও প্রভাব সম্পর্কে তথ্য অনুপস্থিত।[৩৯]

আরব বণিকগণ স্ত্রী-পরিজন নিয়ে বিদেশ সফরে বের হতেন না। কাজেই দীর্ঘ সফরের মধ্যে কোনো স্থানে তাঁরা প্রয়োজন মতো বিরতি করতেন এবং স্বাভাবিক চাহিদা অনুযায়ী সংস্পিণ্ঢষ্ট দেশের বিধর্মী মহিলাদেরকে বিবাহ করতেন। অবশ্য ইসলামী শরীয়তের নির্দেশানুসারে ইসলামে দীক্ষিত না করে তাঁরা যে এ সব মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতেন না তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই এভাবে বহু স্থানীয় মহিলা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।[৪০] এভাবেই তাঁরা বাংলাকে ইসলামী দা'ওয়াতের একটি কেন্দ্রে পরিণত করে বাংলায় স্থায়ী হয়ে যান। এ আরব অভিবাসীদের দ্বারাই বাংলায় ইসলাম প্রচার হয় এবং তাঁদের দ্বারাই ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়।[৪১]

চতুর্দশ শতকে মুসলমানদের বাণিজ্য ও ভূ-পর্যটনে ভাটা পড়তে থাকে। তবুও এ ভাটার যুগে মরক্কো দেশীয় মুসলিম পর্যটক ইবন বতুতা (৭০৩-৭৭৮ হিজরী) তাঁর সফর নামায়

উলেণ্ঢখ করেছেন যে, তিনি গ্রানাডায় ভারতীয়দের সাথে এবং ভারতে গ্রানাডাবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।[৪২] তিনি মালদ্বীপে এক বাঙালী মুসলিম রাজবংশের রাজত্ব দেখেন। ইবন বতুতা তার *সফরনামায়* বলেছেন: "পরমাশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই দ্বীপপুঞ্জের বাদশাহ হচ্ছেন খাদীজা নাম্নী জনৈকা মহিলা। তিনি সুলতান জালালউদ্দীন 'উমার ইবন সুলতান সালাহউদ্দীন সালিহ বাঙালীর কন্যা।[৪৩]

চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরবীয় মুসলমানগণ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন।[৪৪] খ্রীষ্টীয় দশম শতকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম জনপদ গড়ে ওঠে এবং মুসলমানদের নেতা এতখানি শক্তিধর হয়ে ওঠে যে আরাকানের রাজা তাঁর বির"দ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হন।[৪৫] এ ব্যাপারে ভিন্ন তথ্য হচ্ছে আরব বণিকরা চট্টগ্রামে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন না করলেও প্রাচীন কাল থেকে আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে তাদের গভীর প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্বে 'না' সূচক শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষার প্রভাবের ফল। চট্টগ্রামী লোকদের মুখের আদল অনেকেই আরবদের অনুরূপ বলে মনে করেন। চট্টগ্রামের অনেক পরিবার নিজেদেরকে আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবি করেন। চট্টগ্রামের কোন কোন এলাকা, যেমন- *আল করণ*, *সুলক বহর*, *বাকালিয়া* ইত্যাদি আজও আরবী নাম বহন করছে। এ সবই চট্টগ্রাম তথা বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে আরব বণিকদের প্রাচীনতম যোগাযোগের প্রমাণ। আরবী ভাষা, আরবীয় সংস্কৃতি ও আরবীয় রক্তের মিশ্রণ-ই এ এলাকায় ইসলামের ব্যাপক বিস্ড়তির সহায়ক হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।[৪৬]

উপরোক্ত আলোচনা ও তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ইসলামের আবির্ভাবের খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চট্টগ্রামসহ বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটে।

স্থল পথে ইসলামের আগমন

ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন শুধুমাত্র নৌ-পথেই হয়নি বরং স্থল পথেও বহু দা'য়ী ও বিজেতার মাধ্যমে এ উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। 'উমার (রা.) এর আমলে ১৫ হিজরী সনের মধ্যভাগ থেকে সিন্ধু অভিযান শুর" হয়।[৪৭] ছাকাফী গোত্রীয় সেনাপতিগণ[৪৮] বার বার সিন্ধু সীমান্ড় অভিযান পরিচালনা করে এর বিভিন্ন এলাকা দখল করে নেন। এর পর ৪৪ হিজরীতে আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে সেনাপতি মুহালণ্ঢাব ইবন আবী সূফরী সিন্ধু সীমান্ড় অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্না ও আহওয়ায নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এরপর 'আব্দুলণ্ঢাহ ইবন সাওয়ার, রাশিদ ইবন 'আমর জাদীদী, সিনান ইবন সালামাহ, 'আব্বাস ইবন যিয়াদ ও মুনযির ইবন জারূদ আল-'আবদী বার বার হিন্দুস্থান সীমান্ড় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সব অভিযানে মুসলমানরা কখনও সাফল্য আবার কখনও ব্যর্থতার সম্মূখীন হন। তবে হিন্দুস্থান জয়ের স্বপ্ন তাঁরা কখনও বিস্মৃত হতে পারেনি।[৪৯] কারণ হিন্দুস্থান বিজয় সম্পর্কে মহানবী (সা.) এর ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ছাওবান (রা.) হিন্দুস্থান বিজয় সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি হল:

عصابتان من امتى احرهما اله تعالى من النار - عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم -

'আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত দুটি সেনাদলকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দিবেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হিন্দু আক্রমণকারী সেনাদল আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'ঈসা ইবন মারইয়াম (আ.) এর সহযোগী সেনাদল'।[৫০]

অন্য এক বর্ণনায় আবূ হুরায়রাহ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের হিন্দু অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন। কাজেই সে সময় আমি জীবিত থাকলে অবশ্যই আমি তাতে আমার ধন ও প্রাণ দান করতে কুণ্ঠিত হবো না। এতে যদি আমাকে হত্যা করা হয় তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা লাভ করব। আর যদি সহি সালামতে ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি দোযখ থেকে পরিত্রাণ পাব।[৫১]

এসকল অভিযানে কিছু কিছু ব্যর্থতা আসলেও মুসলমানগণ হিন্দুস্তান বিজয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।[৫২] উমাইয়া খলীফা 'আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের শাসনামলে ৭৫ হিজরী সালে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ আছ-ছাকাফী[৫৩] ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত হন। তার ৪০ বছরের শাসনামলের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাচ্য দেশসমূহের সাথে সামুদ্রিক যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিশেষ উন্নতি। তাঁর শাসনামলে কয়েকটি বাণিজ্যিক নৌবহর সুদূর সিংহল দ্বীপ পর্যন্ত যাতায়াত করতো।[৫৪] একদা মুসলমানদের কয়েকটি বাণিজ্যিক জাহাজ ভারতীয় জলদস্যু দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। হাজ্জাজ তদানীন্তন সিন্ধু শাসকের নিকট জাহাজ লুণ্ঠনের উপযুক্ত বিচার ও প্রতিকার না পেয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য সিন্ধু আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। ৯৩ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ আছ-ছাকাফী মাত্র সতের বছরের যুবক মুহাম্মদ ইবন কাসিম আছ-ছাকাফীকে সেনাপতি নিযুক্ত করে স্থল পথে সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ ইবন কাসিম সমগ্র সিন্ধু জয় করে পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত অগ্রসর হন। মুহাম্মদ ইবন কাসিমের এ অভিযানে চার হাজার ভারতীয় জাঠ সৈন্য তার সহযোগী হয়। পথিমধ্যে পুরাতন ব্রাহ্মণ্যবাদ জয় করে যখন তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন সাওয়ান্দারবাসীরাও তার সাথে মিলিত হয়। সাওয়ান্দারবাসীরা সবাই তখন মুসলমান ছিল।[৫৫] তিনি যে নগর জয় করতেন সেখানে একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন। তিনি *দেবল* জয় করে সেখানে মুসলমানদের ইবাদত ও শিক্ষার জন্য মসজিদ নির্মাণ করেন।[৫৬] মুহাম্মদ ইবন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের পূর্ব থেকেই স্থলপথে ভারতে মুসলমানদের আগমন শুরু হয়। সিন্ধু বিজয়ের পর এ আগমণ দ্রুততর হয় এবং অষ্টম শতকের মধ্যেই সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের উপনিবেশ ও বসতি গড়ে ওঠে।[৫৭] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উপমহাদেশে সর্বপ্রথম সিন্ধু দেশই মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন থেকে নিয়ে প্রায় দুশ পঞ্চাশ হিজরী সাল পর্যন্ত সিন্ধুদেশ দামিশক ও বাগদাদের সাথে যুক্ত থাকার পর মানসূরাহ ও দেবলে দুটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৫৮] আর এর সমসাময়িক সময়ে বঙ্গদেশে ইসলামের বিস্তার ঘটে।

অষ্টম শতকে বাংলার বৌদ্ধ সম্রাট ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রী.) তৎকালীন ভারতের রাজধানী হিসেবে বিবেচিত কান্যকুব্জে বিরাট রাজ্যাভিষেক দরবার স্থাপন করেন। তাঁর এ

রাজ্যাভিষেক দরবারে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার ও কীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজা উপস্থিত ছিলেন। এ রাজ্যগুলির মধ্যে যবন রাজ্যটি সিন্ধু নদের তীরবর্তী মুসলিম অধিকৃত রাজ্য ছিল।[৫৯] এ থেকে প্রমাণিত হয়, অষ্টম শতকের শেষের দিকে এবং নবম শতকের গোড়ার দিকে সিন্ধুর মুসলিম রাজ্যের সাথে বাংলার শাসকদের যোগাযোগ ছিল। এবং তাদের মধ্যে দূত বিনিময় হত। তখন বাগদাদের খলীফা ছিলেন হারূন অর রশীদ। তাঁর রাজত্ব মিকরান হয়ে সিন্ধু দেশ অবধি বিস্তৃত ছিল। কাজেই সিন্ধুর মুসলিম রাজ্যের যে নৃপতি ধর্মপালের দরবারে এসেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই হারূন অর রশীদের নিযুক্ত কোন গভর্নর ছিলেন। এ হিসেবে হারূন অর রশিদের সাথে ধর্মপালের যোগাযোগ থাকা স্বাভাবিক। এ সময় বাগদাদ ও বাংলার মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যে, উভয় দেশের মণীষী ও পন্ডিতবর্গ বন্ধুদেশে গমন করে সংশ্লিষ্ট দেশ ও জাতির চিন্তাধারা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন।[৬০]

এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, অষ্টম-নবম শতক থেকেই স্থলপথে বাংলাদেশে ইসলামী দা'য়ীদের আগমন ঘটে এবং এদেশের মানুষ ইসলামের সংস্পর্শে আসে। এর বহু বছর পর দিল্লীর সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেকের সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী কর্তৃক ৫৯৯ হিজরী সালে (১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে) বাংলার পশ্চিম ও উত্তরাংশ জয় করার মাধ্যমে বাংলাদেশ মুসলিম রাজ শক্তির করতলগত হয়। তখন বাংলাদেশের রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন। বিহার থেকে যাত্রা করে দক্ষিণ পূর্বগামী রাস্তা অনুসরণ করে ইখতিয়ার উদ্দীন অতিদ্রুত এবং সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে ভাগীরথী নদীর তীরে লক্ষণ সেনের রাজধানী নদীয়ায় মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করেন।[৬১] লক্ষণ সেন পলায়ন করেন। ফলে বিনা বাঁধায় এ নগর জয় করে ইসলামী খুৎবা পাঠ করানোর ব্যবস্থা করেন।

এ আলোচনার মাধ্যমে একটি বিষয় সজই প্রতিভাত হয় যে রাসূল (সঃ) এর জীবদ্দশায়ই সাহাবীদের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে এবং সেই থেকে ইসলামী দাওয়াত নিয়ে এ অঞ্চলে বনিক মুসাফির মুহাদ্দিস শাসক প্রশাসক দরবেশদের আগমন ধারা চলতে থাকে। এ সকল প্রচারকদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দিয়া মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা সর্বোপরি পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা। মুসলিম উম্মাহর এ দায়িত্ববোধের কারনেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে এবং মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়।

তথ্যনির্দেশ

১ সূরা হামীম সিজদাহ: আয়াত ৩৩

২ ইমাম নাসাঈ, *আস-সুনান* (রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৯৯১ খ্রী.), পৃ. ৪৩৮।

৩ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৩৩।

৪ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা: ১৯৬৫ খ্রী.), পৃ. ১৭৫।

৫ *ইসলামী দা'ওয়াহর মর্মকথা ও ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য*, পৃ. ১২৯।

৬ নাসির হেলাল, "বাংলাদেশে ইসলামের আগমন", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৩৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা, এপ্রিল-জুন ২০০০ খ্রী., পৃ. ৬৩।

৭ *ইসলামী দা'ওয়াহর মর্মকথা ও ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য*, পৃ. ১২৯।

৮ James Tailor, "Remarks on the Sequal to Peripulus of Erithrian Sea", *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. 16 (1847), p. 76.

৯ *Ibid*.

১০ নাসির হেলাল, "বাংলাদেশে ইসলামের আগমন", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পৃ. ৭৫।

১১ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৩৩।

১২ *প্রাগুক্ত*।

১৩ সাইয়িদ সুলায়মান নাদভী, *আরবোঁ কী জাহাজরানী* (আযমগড়: ১৩৫৪ হি.), পৃ. ৮১-৮২।

১৪ *ইসলামী দা'ওয়াহর মর্মকথা ও ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য*, পৃ. ১৩০।

১৫ মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস* (ঢাকা: আজাদ পাবলিকেশন্স লি., ১৯৬৫ খ্রী.), পৃ. ৪৯।

১৬ নাসির হেলাল, "বাংলাদেশে ইসলামের আগমন", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পৃ. ২১।

১৭ মুহিউদ্দীন খান, "বাংলাদেশে ইসলাম: কয়েকটি তথ্য সূত্র", *মাসিক মদীনা*, জানুয়ারী ১৯৯২ খ্রী., পৃ. ৪০।

১৮ নাসির হেলাল, "বাংলাদেশে ইসলামের আগমন", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পৃ. ২১।

১৯ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ২০-২১।

২০ Samander where rice was produced in abundaance and to which aloe-wood was brought down for expord from a distance of 15 or 20 days through sweet water from a territory named Kamrun and other place. Cf. Ibn Khurdadbih, *Kitab al Masalik wa al-mamalik* (Leiden: E.J. Brill, 1889), pp. 63-64; Dr. Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal*, Vol. 1A (Dhaka: Islamic Foundation of Bangladesh, 1985 A.D), p. 30;

The Arabic text of this book runs as follows: ومها سمندر عشرة فراسخ وفيها أرز يحمل اليها العود من مسيرة خمسة عشر يوما وعشرين يوما فى ماء عذب من كامرون وغيرها ـ

২১ ড. আব্দুল করিম, *চট্টগ্রামে ইসলাম* (চট্টগ্রাম: সোসাইটি ফর পাক স্টাডিজ, ১৯৭০), পৃ. ৪-১৫।

২২ *History of the Muslims of Bengal*, Vol. 1A, p. 30.

২৩ নাসির হেলাল, "বাংলাদেশে ইসলামের আগমন", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পৃ. ২১-২২।

২৪ ড. এম এ রহিম, *সোশ্যাল এন্ড কালচারাল হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল*, পৃ. ৩১; *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৬৬।

২৫ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৭৮।

২৬ মুহিউদ্দীন খান, "বাংলাদেশে ইসলাম: কয়েকটি তথ্যসূত্র", *মাসিক মদীনা*, পৃ. ৪০।

২৭ *চট্টগ্রামে ইসলাম*, পৃ. ১৫-১৬; *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৬৬।

২৮ এ প্রসংগে ড. মোহর আলী উলিণ্ঢখিত ঐতিহাসিকগণের তথ্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, Jazirat al-Rami comes after sarandip and contains peculiar unicorn animals and little naked people. al Masudi mentions it as a riparian country after sarandip and on the Indian ocean. cf. *History of the Muslims of Bengal*, Vol. 1A, p. 34.

২৯ নাসির হেলাল, "বাংলাদেশে ইসলামের আগমন", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পৃ. ২২।

৩০ *History of the Muslims of Bengal*, Vol. 1A, p. 36.

৩১ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৬৬-৬৭।

৩২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭; Dr. M A Rahim and *et al*., *Islam in Bangladesh Through Ages* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1995 A.D), p. 13.

৩৩ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৬৭।

৩৪ মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *বাংলা ও বাংগালী: মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা* (ঢাকা: সূজন প্রকাশনী লিমিটেড, ১৯৯৭ খ্রী.), পৃ. ১০৮।

৩৫ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *হাদীছ সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪খ্রী.), পৃ. ৪৫৭।

৩৬ *প্রাগুক্ত*।

৩৭ *প্রাগুক্ত*।

৩৮ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৬৭।

৩৯ নাসির হেলাল, "বাংলাদেশে ইসলামের আগমন", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পৃ. ২৪।

৪০ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৬৭।